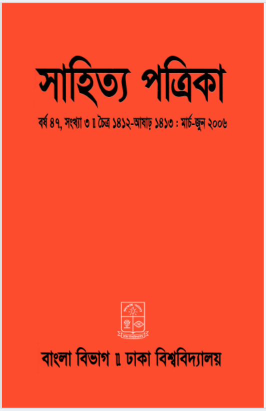

Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রাখালী : লোকজ মননের পুনর্বয়ন

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শিল্পী খানম
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.10
Pages	165-176
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রাখালী : লোকজ মননের পুনর্বয়ন

শিল্পী খানম*

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন সাহিত্যিক মূল্যসমৃদ্ধ চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনভজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে বাস্তব লোকজ জীবন ও উচ্চমানের গীতিময়তা। বড়ু চণ্ডীদাসের হাতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য, রাধাকৃষ্ণের লীলা ধর্মের মাহাত্ম্য ছাপিয়ে গোয়ালা সম্প্রদায়ের জীবনাচরণের ছবিতে পরিণত হয়েছে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ও শেষ কবি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জীবনাভাস সে কালের লোকজ জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। আঠারো শতকের কবিগানে সমকালীন সমাজের তথা লোকজীবনের চিত্র না মিললেও সে কালের লোকজ রুচির পরিচয় তাতে ফুটে উঠেছে। অবশ্য পল্লীগীতিতে অথবা লোককাহিনীগুলোতে লোকজ জীবন ও মননের প্রতিফলন সব সময়ই চলছিল। মধ্যযুগে কবিতা ও গান ছিল সমার্থক। আধুনিক যুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-৭৩) গান থেকে কবিতাকে আলাদা করে ফেললেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে এক ধরনের রেনেসাঁসের অনুভূতির জন্ম হয়। অনেকটা তারই যেন মানসপুত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল আধুনিক কবিতায় বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর নাট্যকর্মে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন নির্দ্বিধায়। এর পর বাংলা কাব্যে আগমন ঘটে আধুনিক গীতিকবিতার ধারা-স্রষ্টা 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫- ৯৪)। পরবর্তী বহু কবির দ্বারা এই ধারাটি হয়েছে সমৃদ্ধ।

তবে এটি সত্যিতার ভাবে চূড়ায় আরোহন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (৮৬১-১৯৪১) হাত ধরে। প্রেম ও প্রকৃতির উপাসক রবীন্দ্রনাথ চেতনায় ও মননে ছিলেন গীতিময় ও নাগরিক। তার পরও পল্লীর কথা ও ছবি, পল্লীগীতি ও সুর তাঁর মন হরণ করেছিল। পল্লীসাহিত্যের প্রতি আমাদের সবার দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। পল্লীর উন্নতির জন্যে তিনি বিপুল অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন। তিনিই প্রথম গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা চালান। বলা বাহুল্য, এ

* সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা

ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তিনি ছিলেন সেকালের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি প্রাগ্রসর। সে কারণে, তিনি অনেক সময় সফল হতে পারেন নি। গ্রামীণ সুর, বিশেষ করে বাউল গানের সুর, তিনি গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটাই তো লেখা গ্রামীণ তথা লোকজ সুরে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে দৈশিক নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, আন্দোলন ও সংগ্রাম বাংলা সাহিত্যের ভুবন থেকে ভাবালুতার অবসান ঘটায়। সে সময় কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কাব্যের জগতে রোমান্টিতার পাশাপাশি নিয়ে আসেন বিদ্রোহ ও বিপ্লবের চেতনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপসহ সারা বিশ্বে মূল্যবোধে আসে পরিবর্তন। মহাযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, ফ্যাসিবাদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনায় এদেশের কবি সাহিত্যিকরা উদাসীন থাকতে পারলেন না। মানবভাবনায় তাঁদের চিত্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে অন্য এক ধরনে। যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় একার্থে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে তার যেন সমাপ্তি ঘটে রবীন্দ্রপর্বের শেষ পর্যায়ে। ফলে তাঁরা রবীন্দ্রসৃষ্ট স্বপ্ন-কল্পনার বলয় থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ অনুভব করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্য* (১৯৫৪) নামের সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ অনেককেই আধুনিক কবি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য দিকে এক জন সমালোচক রবীন্দ্রনাথকেই আধুনিক মনে করেন না।[১] সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ তো ননই।[২] কাজী নজরুল ইসলামকে বলা হয়েছে 'এক বড়ো প্রথাগত পদ্যকার'।[৩] অর্থাৎ তিনি কবিই নন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ ধরনের একদেশদর্শী কথা সমর্থনের অবকাশ এখনও তৈরি হয় নি। যেমন, জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেছেন, 'রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের যে-সাধনায় আধুনিক তরুণ কবিরা তখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী, জসীম উদ্‌দীন তাতে প্রায় অনায়াসে সাফল্য লাভ করেছিলেন।'[৪] যাই হোক, পালা বদলের এই ক্রান্তিলগ্নে এক ঝাঁক তরুণ কবির আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-৬৯), সমর সেন (১৯১৬-৮৭), আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের হাতেই তিরিশের দশকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত আধুনিক কবিতার নবতর ধারা সূচিত হয়। এ সকল কবি সচেতনভাবে কবিতার বিষয়, আঙ্গিক, উপমা, রূপকে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন। অবশ্য এই ধারার প্রায় সকল কবিই আধুনিক

ইউরোপীয় কবিতার ভাবধারায় হন অনুপ্রাণিত। তাঁদের কাব্য ছিল প্রধানত শহরকেন্দ্রিক। কলাকৈবল্যবাদের পাশাপাশি মার্কসবাদের চর্চাও এঁদের অনেকের কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। ফ্রয়েডের প্রভাবও অনেকের রচনায় নগ্ন বাস্তবতার পটভূমিতে উপস্থিত হয়েছে। রহস্যে ঘেরা যৌনচেতনা নিয়ে সে সময় সৃষ্টি হয়েছিল একটি উদগ্র আগ্রহ। বলা যায়, সেই সময়টিতে অর্থ, ক্ষমতা ও যৌনচেতনার খেলা অনেক লেখকের রচনায় প্রাধান্য পায়। অবশ্য, তদ্দিনে পশ্চিমে এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে গিয়েছিল। সেই অগ্রগতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়ে পড়েছিল বিপন্ন। এখানে কোন কোন শহুরে লেখকের মনে মার্কস, ফ্রয়েড বা ক্ষমতাতত্ত্ব নিয়ে এক ধরনের রোমান্টিকতার জন্ম হয়েছিল। তবে এটি স্বীকার্য যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষ ও তার অস্তিত্বের সঙ্কট মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উঠে এসেছে এঁদের প্রায় সকলেরই কবিতায়। শহুরে এই সব কবি যে লোকজীবনের প্রতি অনীহ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁদের কেউ পল্লীকেই ধ্যানজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন নি।

যেমনটি করেছিলেন জসীম উদ্‌দীন। তিরিশের কবিদের মুখপত্র ছিল 'কল্লোল' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকা। নগরকেন্দ্রিকতার সেই প্রবণতার মধ্যেও লোকঐতিহ্য ও লোকজীবনের নানা বিষয় সমকালীন কবিতার উপাদান হয়েছে। সেই সময় 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় যেমন, তেমনি সমসাময়িক আরও অনেকের কবিতায় লোক জীবনাচরণের নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ বাংলার নিসর্গকে কাব্যে উপস্থাপন করেছেন নতুনভাবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সুগভীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা। বিষ্ণু দে একদিকে লোকজ ঐতিহ্যের আশ্রয় নিলেন আর অন্যদিকে মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের কথাকে কবিতার বিষয় করলেন। এ ছাড়া বিশ শতকের প্রথম দিকে আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে আরও যে সকল কবি গ্রামীণ প্রকৃতির কাছে ছুটে যান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কালিদাস রায় প্রমুখ।

বাংলা কবিতার ঋতুবদলের কবি জসীম উদ্‌দীন। 'তিনিই আধুনিক কাব্যে উপেক্ষিত পল্লীকে নতুন কাব্যিক আঙ্গিকে মহিমা দান করে বাংলার প্রাচীন ও নবীন ধারার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। সমকালীন কাব্যাদর্শের কাছে তা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল।'[৫] তিনি এক মৌলিক বাঙালি কবি। আধুনিক কবিদের কেউ কেউ শহরের বিষণ্নতা থেকে শান্ত স্নিগ্ধ জীবনের দিকে তাকাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তবে, এ ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীন স্বতন্ত্র। তিনি লোকায়ত ঐতিহ্যের ব্যবহার করেছেন নিজস্ব বাণীভঙ্গিতে। কেন না তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পল্লীতে। এ কারণে, সহজ লোকজ বিষয়কে তাঁর কাব্যে ঠাঁই দিতে তিনি ছিলেন না দ্বিধান্বিত। বস্তুত, লোকজ বিষয় ও বাণীভঙ্গিকে কবিতায় মোহনীয় রূপে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি প্রায় অনন্য।

কবির মনোভঙ্গিতে, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে লোকজ উপাদান যেন স্বাভাবিক ও অনিবার্য ভঙ্গিতেই স্থান করে নিয়েছে। 'তিনি বাল্যে পুঁথিসাহিত্যের হাওয়ায় লালিত হলেও, পূর্ব বাংলার লোকগীতি গাথার মধ্যেই অচিরে খুঁজে পেয়েছিলেন আপন আত্মার উৎসারণের পথ'[৬]। কর্মসূত্রে অর্থাৎ জীবনের স্বাভাবিক তাগিদেই তিনি গ্রাম বাংলায় ঘুরে বেড়াতেন এবং মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করতেন পল্লী বাংলার সৌন্দর্য। তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে এই মুগ্ধতার ছায়াপাত ঘটেছে। বাংলার কৃষকের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর রচনায়। জসীম উদ্‌দীন সেই ব্যতিক্রমী বংশীবাদক যাঁর বাঁশিতে লীলায়িত হয়েছে বাংলার রাখালিয়া সুর। তাঁর কাব্যধারায় পল্লীজীবনের ঘটনাপ্রবাহ, পল্লীর রূপ বৈচিত্র্য এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তিনি আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন গ্রামীণ জীবনের পটভূমি এবং গ্রাম্য জীবন কাহিনীর বিচিত্র প্রসঙ্গ। তিনি যখন বি.এ. শ্রেণীর ছাত্র তখনই তাঁর প্রথম খণ্ড কবিতার সংকলন *রাখালী* (১৯২৭) প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের *রাখালী*, *কিশোরী*, *তরুণ কিশোর* প্রভৃতি কবিতায় গ্রাম বাংলার নরনারীর প্রেমভাবনা এবং তাদের নানা রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। এর পাশাপাশি সংসার জীবনে মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কাতর নর-নারীর ছবি *মা*, *পল্লীজননী*, *কবর*, *পাহাড়িয়া* প্রভৃতি কবিতায় যেন লাভ করেছে শিল্পরূপ। মৃত্যুর পটভূমিতে মানুষের দুঃখবোধের কাহিনী হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবিতায় রূপায়িত করার ক্ষেত্রে তিনি এক ধরনের অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন। শাশ্বত পল্লীজীবনের হৃদয়গ্রাহী চিত্র মেলে *রাখালী* কাব্যের *রাখাল ছেলে*, *কৃষাণ-দুলালী*, *শাকতুলুনী*, *জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়*, *মেনা শেখ* প্রভৃতি কবিতায়। এ ছাড়া এ কাব্যে আছে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে রচিত বেশ কিছু কবিতাও ; যেমন, *সিঁদুরের বেসাতি*, *বৈদেশী বন্ধু*, *সুজন বন্ধুরে*, *মনই যদি নিবি*, *গহীন গাঙের নাইয়া* প্রভৃতি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা লোকজ উপাদান তাঁর প্রায় সব রচনাতেই পাওয়া যায়।

লোককাহিনী, লোককথা, বারমাসি, ছড়া, ধাঁধাঁ, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, লোকবিশ্বাস, কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উপাদান। একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনেকখানি লোকজ উপকরণ-নির্ভর। বস্তুত, লোকজ বিষয় নিয়ে কাব্যচর্চায় জসীম উদ্‌দীন ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগ কৌশলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আধুনিক সাহিত্যে আলাদা আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর একটি বিশেষ কৃতিত্ব হলো, তিনি লোকজ বিষয়কে পরিমার্জিত রূপে আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে একজন আধুনিক শিল্পীর মানসিকতার পরিচয় যেমন তিনি দিয়েছেন, তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতাকে

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নতুন আঙ্গিকে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। গ্রাম-জীবন ও গ্রামীণ-সংস্কৃতির প্রায় অযত্নে রক্ষিত অনুজ্জ্বল উপকরণগুলো তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে অনায়াসে। লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গ যেন তাঁর কাব্যের এক মৌল উপকরণ। বাংলা কাব্যের লোক-ঐতিহ্য ও লোকজীবনের সঙ্গে ময়মনসিংহ গীতিকার ভাবানুষঙ্গ— প্রেম ও বিরহ — যেন সুসমন্বিত হয়ে *'রাখালী'* কাব্যে নতুনভাবে পরিবেষিত হয়েছে। জসীম উদ্‌দীন লোকজ মননের পুনর্বয়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে এক জন সমালোচক বলেছেন, 'বাংলা কবিতার ধারাবদলের মুখেও লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক নিবিড় আত্মীয়তা ও সেতুবন্ধন নির্মাণের সবুজ স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন'।[৭] পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার অভিঘাতে যে লোকজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবহেলিত হচ্ছিল তার যেন নব উত্থান ঘটিয়েছেন তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যে। তার সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন যথোপযুক্ত লোকজ ভাষা, ছন্দ ও মেজাজ। সে দিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, খণ্ড কবিতার সংকলন *'রাখালী'* কাব্যে আছে লোককাহিনী, লোকসংস্কার-বিশ্বাস, লোকসঙ্গীত, লোকজ আচার-অনুষ্ঠান, লোকজ শিল্পসামগ্রী, লোকজ শব্দ ও ভাষার প্রয়োগ, ছড়ার ছন্দ ইত্যাদি।

লোক কাহিনী :

কাহিনী শোনার বাসনা মানুষের জন্মগত। লৌকিক ও অলৌকিক নানা বস্তুর সমন্বয়ে মানুষ গল্পের পর গল্প তৈরি করে আত্মতৃপ্তিতে মেতে ওঠে। আবহমান কালের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার মধ্যে গ্রামের মানুষ তাদের মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সন্ধান করেছে পুথিসাহিত্য, লোকগীতিকা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী, জারি ও সারিগানের মধ্যে। ধর্ম ও সংস্কৃতির গ্রামীণ রূপের মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। মধ্যযুগের ধারাবাহী পুথিসাহিত্য ও গ্রাম্য গীতিকার রসধারায় তারা সিক্ত হয়েছে। *রাখাল'* কাব্যের অনেক কবিতাতেই রূপকথা, উপকথা, বাস্তব-অবস্তাব নানা ঘটনা স্থান করে নিয়েছে। যেমন *মা* কবিতায় আছে রূপকথার প্রসঙ্গ :

ভেসে চলে গেল উজানি নগরে উজানি নদীর পানি,
তারি সাথে গেল মদন-কুমার মধুমালা সন্ধানী।
কাহিনীর গাঙে ভাসিয়া চলিল হুমরা বেদের টোল,
'ঝড়ি ও বৃষ্টি' অন্ধকারে'তে বসিয়া বাজায় ঢোল।
চেকন সুরেতে গান গেয়ে কাঁদে মহুয়া বেদের মেয়ে,
কলস তাহার হারায়ে এসেছে জলের ঘাটেতে যেয়ে।
স্রোতে ভেসে গেল কমলা রাণীর সত্য-দীঘির জল,
তীরে দাঁড়াইয়া হাজার মানুষ-চোখগুলি ছলছল।[৮]

লোকসংস্কার-বিশ্বাস :

লোকসংস্কার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাজাত লোকজ রীতি যা মানুষের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে কালক্রমে। এটা মানব জাতির এক আদিম ঐতিহ্য যা জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, বলা যায়, মানুষের মজ্জাগত। এর প্রভাব বিদ্যমান জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। গ্রামের অধিকাংশ আনুষ যা বিশ্বাস করে এবং প্রতিদিনের জীবনধারায় যা লালন করে তা সহজে তারা ত্যাগ করতে পারে না। প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার সাধারণত সৃষ্টি হয় গ্রামীণ মানুষের জীবনাচরণের গভীর উৎস থেকে। দীর্ঘদিন ধরে লালিত বিশ্বাসই মানুষের মনে বাসা বাঁধে এবং কালক্রমে তাদের মনে তৈরি হয় তার সুদৃঢ় ভিত্তি। এ জন্যে এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসের মাত্রা প্রবলতম। বস্তুত, জীবনের প্রয়োজনেই এ সবের সৃষ্টি। লোক সংস্কৃতির ধারক হিসেবে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা এই লোকজ উপাদানের ব্যবহার আছে এবং থাকবে। লোকজ উপাদানগুলো একদিকে সামাজিক উপযোগিতার, অন্যদিকে নান্দনিক আনন্দের উৎস হয়ে বেঁচে আছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনে। মানুষকে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, নানা প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে জীবনের পথে চলতে হয়। এর ফলে সে সঞ্চয় করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। লোকসংস্কার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতারই ফল। ক্ষতির আশঙ্কা থেকে বা অমঙ্গল চিন্তা থেকে মানুষ মসজিদে মোমবাতি দেয়, পীরের দরগায় দান করে, সিন্নী দেয় ও হাতে বাঁধে তাবিজ। *পল্লীজননী* কবিতায় মা ছেলের মঙ্গল কামনায়, আশুরোগমুক্তির জন্যে আল্লাহ, রসুল ও পীরের দোহাই পাড়ে, মানত করে, দরগায় দেয় টাকাপয়সা এবং নামাজ ঘরে জ্বালায় মোমবাতি। যেমন,

> নামজের ঘরে মোমবাতি মানে দরগায় মানে দান
> ছেলেরে তাহার ভাল করে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ
> ভালো করে দাও আল্লা-রছুল ! ভাল করে দাও পীর !
> কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর ! [৯]

কৃষাণদুলালী কবিতায় লোকসংস্কার তাবিজের উল্লেখ আছে। গ্রামের কৃষকের কন্যা তার অন্যান্য সাজসজ্জার সঙ্গে পীরের দেয়া তাবিজও বেঁধেছে বাহুতে। অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে পল্লীর মানুষ তাবিজ ব্যবহার করে থাকে। তরুণী মেয়েদের উপর যেন কোন মানুষের কিংবা ভূত-প্রেতের আছর না পড়ে তার জন্যও তাবিজ দেওয়া হয়। যেমন,

> বাহুতে তার তাবিজ বাঁধা গেঁয়ো পীরের দান,
> ঝুমকো ঢেঁড়ির-প্রেম-আলাপন শুনছে নিতুই কান
> বারে বারে ঘোমটা খসে লাজ-মেশা-নিলাজ,
> পুতুলটিরে বউ সাজাতে নিজেরও বউ সাজ। [১০]

লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গে শীরালীদের মন্ত্র, খোয়াজ খিজির, গাজী মাদার-পীরের কথা লোক সমাজে মানা হয়। এতে দুর্ভোগের হাত থেকে পরিত্রাণ মেলে বলে অনেকে মনে করে। খোয়াজখিজির কোন কোন এলাকায় খোয়াজপীর নামে অভিহিত। তিনি সর্বত্র পানির মালিক হিসেবে পরিগণিত ও সম্মানিত। জনসাধারণের বিশ্বাস খোয়াজখিজির নৌকাডুবি থেকে যাত্রীদের রক্ষা করেন। *মেনা শেখ* কবিতায় লোক বিশ্বাসের চমৎকার অবতারণা করা হয়েছে। যেমন,

> ঝড় এসে ঘর উড়িয়ে নিলে ঝড়েই ঘরে দেই যে ছানি,
>
> ভয় করিনে বৃষ্টি-শিলা-শীরালীদের মন্ত্র জানি।
>
> ভয় করিনে হাঙর কুমুর -দেবতা আছেন খেয়াজখিজির
>
> বনের বাঘে ভয় করিনে গাজী মাদার হাঁকছে জিকির।[১১]

শাহমাদার ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। মাদার পীর বাঙালির লোকমানসে দেবাত্মায় পরিণত হয়েছেন। তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে। বাংলা এবং বাংলার বাইরে সাধারণভাবে তিনি শাহ মাদার নামে পরিচিত। ধর্ম বিশ্বাস এক পর্যায়ে লোকসংস্কারে পরিণত হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস মজ্জাগত। *রাখালী* কাব্যের *কবর* ও *পল্লীজননী* কবিতায় ইসলামী ঐতিহ্য-পুরাণ ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামী-ঐতিহ্য হিসেবে আল্লাহ, বেহেশত, নামাজ, মসজিদ, আজান, দোয়া-দরুদ প্রভৃতি বিষয় এ দুটি কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের পাশাপাশি জসীম উদ্‌দীন হিন্দুর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পৌরাণিক অনুষঙ্গকে গ্রহণ করেছেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে।[১২] *রাখালী* কাব্যের *মা* কবিতায় এর দৃষ্টান্ত মেলে :

> তুলসীর মূলে প্রদীপ রাখিয়া মাটিতে প্রণাম রাখি,
>
> ওদের গেহের কল্যাণশিষ ধরণীতে যায় মাখি।
>
> সেই জানকীরে হেরিলাম যেন লব-কুশ কোলে করে।
>
> ঋষির আঙ্গিনা করেছে উজল আকাশের চাঁদ ধরে।

কাব্যে লৌকিক রস সৃষ্টির অন্যতম অনুষঙ্গ শিব-গৌরীকেও তিনি অভিনব আঙ্গিকে ব্যঞ্জিত করেছেন। *রাখালী* কাব্যের *জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়* কবিতায় তার প্রমাণ মেলে :

> লাভের মধ্যে হাজরা-তলা দুগ্ধেতে যায় ভাসি,
>
> গঙ্গাদেবীর কপাল ভালো পূজায় উঠেন হাসি।

লোকসঙ্গীত :

বাংলাদেশ গানের দেশ বলে পল্লীর লোকমুখে রচিত হয়েছে অজস্র গীতিকা। এ গানগুলোর মধ্যে পল্লীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রেম, বিরহ-বিচ্ছেদ বেদনার কথা যেমন রয়েছে তেমনি তাতে রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক আকুলতার পরিচয়। *রাখালী* কাব্যে এ ধরনের বেশ কিছু গান সংকলিত হয়েছে। অজস্র বাউল, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী গানে প্রকাশিত হয়েছে বাঙালির লোকায়ত জীবন ভাবনা। ছয় ঋতুর পরিবর্তনের পটভূমিতে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কৃষিনির্ভর সমাজে প্রকৃতির নিত্য নতুন বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য মানুষের মনে সৃষ্টি করে নতুন নতুন ভাব ও সুর। প্রকৃতি-সংলগ্ন মানুষের জীবনে বারো মাসে তের পার্বণের যে বিপুল ঘটা তার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হলো নাচ ও গান। মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে বারোমাসী গান রচনার ব্যাপক রেওয়াজ ছিলো। কবি রারোমাসী সুরেই রচনা করেছেন *বৈদেশী বন্ধু* কবিতাটি। তাঁর এ ধরনের গানে লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতির নানা বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে। যেমন উক্ত কবিতায় আছে,

যাওরে বৈদেশী বন্ধু যাও হাপন ঘরে,
অভাগী অবলার কথা রাইখ মনে করে।
তোমার দেশেতে বন্ধু ফুটবে কদমকলি,
আমার দেশে কাজলা মেঘা নামবে ঢলাঢলি।[১৩]

নিশ্চিত প্রিয় বিচ্ছেদের সম্মুখীন নারী হৃদয়ের বিরহ ব্যাকুল আর্তি বেজে উঠেছে এই গানে। এ ছাড়া লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন সুরে জসীম উদ্‌দীন রচনা করেছেন *রাখালী* কাব্যের আরও কয়েকটি গান। ঘাটুগানের সুরে রচনা করেছেন *মনই যদি নিবি*। ঘাটু গান মূলত প্রেমসঙ্গীত। তাঁর *গহীন গাঙ্গের নায়া* লেখা ভাটিয়ালি সুরে। এই গানে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাণের সুরই যেন গুঞ্জরিত হয়েছে। যেমন,

আমার গহীন গাঙ্গের নায়া !
(ও তুমি) অফর বেলায় লাও বাইয়া যাওরে-
(ওরে ওরে ও দোরদী) কার পানে বা, চায়া। [১৪]

ভাটিয়ালি সুরে জসীম উদ্‌দীন রচিত গানগুলো শিক্ষিত ও নিরক্ষর সকল মানুষের মন ছুঁয়েছে, বৃহত্তর লোকসমাজকে উদ্দীপিত করেছে। জসীম উদ্‌দীন তাঁর পল্লীগীতিতে অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্যে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দ পরিহার করে শহরে ও গ্রামে সহজবোধ্য ও শিষ্ট শব্দরাজি ব্যবহার করেছেন। ফলে, তাঁর গীতিকাগুলো হয়েছে যুগোপযোগী। এ ভাবেই তিনি বিপুল মানুষের কাছে পল্লীগীতি নতুন রূপে তুলে ধরে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

লোকজ আচার-সংস্কার :

গ্রাম-বাংলায় বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়েও গড়ে উঠেছে নানা লোকাচার। বিয়ের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে এবং উভয় পক্ষের মধ্যস্থতা করতে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে ঘটক। সফল ঘটকালির পর হয় যে বিবাহ অনুষ্ঠান তা সব দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি শুভ অনুষ্ঠান হিসেবেই পরিগণিত হয়। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য এবং নানাবিধ বিপদ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে পল্লী জীবনের লোকাচারগুলো গড়ে উঠেছে। অতীত কাল থেকে চলে আসা এ সব আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মিশেল দেখতে পাওয়া যায়। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গায়ে হলুদ, বরণকুলা, দূর্বাদান, আলপনা আঁকা ইত্যাদি। *রাখালী* কবিতার এক জায়গায় আছে,

> সেদিন রাখাল শুনল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে,
> আসবে কালি নওসা তাহার ফুল পাগ্‌ড়ী মাথায় দিয়ে।
> আজকে তাহার হলদি কোটা, বিয়ের গানে ভরা বাড়ি,
> মেয়ে-গলার করুণ গানে কে দেয় তাহার পরাণ ফাঁড়ি।[১৫]

বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে গ্রামের ও শহরের ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পরিবারে বিবাহোৎসবে গায়ে হলুদ একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। হিন্দু সধবারা শাঁখা-সিঁদুর পরে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন ; হিন্দু আচার অনুসারে অবশ্য-ব্যবহার্য দুটি উপাদান। সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার একটি শাস্ত্রীয় মাঙ্গলিক প্রথা। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠানে তেলসিঁদুর, দূর্বা, বরণকুলো প্রভৃতি লোকচারসম্পৃক্ত মাঙ্গলিক উপাদান। এ ছাড়া নানা শুভ কর্মে ধান দুর্বা ব্যবহার অত্যাবশ্যক প্রচলিত রীতি। তাঁর দীর্ঘ *মা* কবিতায় কাহিনী বর্ণনায় এ সব লোকাচারের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। যেমন,

> মা গেছে ছাড়িয়া ! ওই ছেলেদের বধূরা আসিছে ঘরে,
> আলপনা আঁকা উঠানের পরে রাঙা পাও ধরে ধরে ;
> বাড়ির গৃহিণী ধানদুর্বায় বরণ কূলাটি ধরি,
> নয়া লক্ষ্মীরে পুরাণ লক্ষ্মী লইছে বরণ করি।[১৬]

লোকজ শিল্পসামগ্রী :

মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতে তৈরি করেছে নানা উপকরণ। তার অনেকগুলোই লোকশিল্পের অন্তর্গত। এ সব লোক শিল্পোপকণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীদের ব্যবহার্য অলংকারাদি, নানা প্রকার নকশা, কাঠের

তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্রাদি, গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য উপকরণ, কৃষিসম্পর্কিত নানা সামগ্রী প্রভৃতি। *রাখালী, কবর, তরুণ কিশোর, পল্লীজননী* প্রভৃতি কবিতায় এ সবের উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

> শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
> রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভরে।
> খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে,
> ফুলঝুরি শিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।[১৭]

লোকজ শব্দ ও ভাষার প্রয়োগ :

জসীম উদ্‌দীনের *রাখালী* কাব্যের অন্যতম অভিনবত্ব হলো এতে লোকজ শব্দ ও কথ্য বাকভঙ্গির প্রয়োগ। 'পল্লী পারিপার্শ্বিকের যথার্থ আবহ সৃষ্টির অনুরোধে কবি প্রচুর গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করেছেন।'[১৮] গ্রামীণ জীবনাচরণে নিত্য ব্যবহার্য কথ্য অথচ সহজবোধ্য শব্দাবলি কবিতায় নির্দ্বিধায় ব্যবহার করে তিনি গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনীসত্যকে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরেছেন। *রাখালী, পল্লীজননী, কবর* প্রভৃতি কবিতায় কথ্য ভাষার এ ধরনের প্রয়োগ উল্লেখ করার মতো। যেমন,

> এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও পথ দিয়ে চলতে ধীরে,
> ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।
> দোষ কি তাহার ? ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হাসে,
> গাঁয়ের রাখাল! –অমন রূপে কেমনে রাখে পরাণটা সে ?
> এ পথ দিয়ে চলতে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
> ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভরে।
> মাঠের হেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
> পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রানছে যেথায়?[১৯]

ছড়ার ছন্দ :

জসীম উদ্‌দীন আধুনিক শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা রচনা করা সম্ভব হয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যের বিষয় ও ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্যে তাঁর *রাখালী* কাব্যে গ্রামীণ ভাষা ও কাহিনীতে লোকজ ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পল্লীর কথা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করার উদ্দেশ্যেই তিনি নির্বাচন করেছেন এই ছন্দ। *রাখাল ছেলে* কবিতায় আছে এর প্রমাণ :

> রাখাল ছেলে ! রাখাল ছেলে ! বারেক ফিরে চাও,
> বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?[২০]

জসীম উদ্‌দীন বিশ শতকের মানুষ। তিনি পল্লীসন্তান, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ও ত্রিশের কবিকুল পর্যন্ত যে বাংলা কাব্যধারা তা গঠন করে তাঁর মনন ; কিন্তু আক্ষরিকার্থে তিনি তাঁদের সহযাত্রী হলেন না। কাব্যের নগরকেন্দ্রিক রাজপথ থেকে দূরে সরে এসে তার পল্লীপথেই চলতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর কাব্যে তাঁদের কোন প্রভাবই পড়ে নি। বস্তুত, সবার ভেতরে থেকেও তিনি ছিলেন আলাদা। তাই বলা যায়, জসীম উদ্‌দীন তাঁর কালের প্রায় সকল কবি থেকেই প্রকৃতি ও মানসধর্মে অনেক খানি পৃথক ছিলেন। পৃথক ছিলেন তাঁদের থেকে কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেও। তাঁর মানস গঠনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে তাঁর বংশগত পরিস্থিতি ও ঐতিহ্য, সামাজিক অবস্থান, পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা, বিত্তগত অবস্থা প্রভৃতি বাস্তব কারণের দ্বারা। তাঁর জন্মস্থান ফরিদপুরে বসবাসরত ছিল যে বিশাল মুসলমান সম্প্রদায় ও নমোসম্প্রদায় — যারা প্রধানত কৃষিজীবী — তাদের মধ্যেই ঘটেছিল তাঁর আবির্ভাব। এরা যুগ যুগ ধরে পল্লীতে বসবাসরত ; সে কারণে, তাদের জীবন ভঙ্গিমা ও জীবন দৃষ্টিও পল্লীকেন্দ্রিক। কৃষিভিত্তিক সেই সমাজের লালনক্ষেত্র শ্যামল পল্লীর অপরূপ প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, জীবনাচরণের সরলতা, স্বাভাবিক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং একই সঙ্গে অদৃষ্টবাদিতা এদের জীবন ও চরিত্র গঠনে পালন করেছে মৌল ভূমিকা। পল্লীর কৃষক সম্প্রদায়ের ভেতরেই তিনি বেড়ে উঠেছেন বলে পল্লীর মাঠঘাট, ক্ষেত-খামার, নদীতীর, বালুচর, পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘর ইত্যাদির মধ্যে যে বৈচিত্র্যময় জীবন যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত, সেখানেই যেন তাঁর মন বাঁধা পড়ে থাকতো। উচ্চ শিক্ষা ও চাকরিসূত্রে প্রথমে কলকতা ও পরে ঢাকা শহরে অবস্থান করলেও পল্লীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর সংযোগ কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হয় নি। বরং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে লোকগীতি ও গাঁথার সংগ্রাহক হিসাবে দীর্ঘদিন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে লোক-সাহিত্যের সম্পদ সংগ্রহকালে তিনি পল্লীকে আরও ব্যাপকভাবে নিবিড়ভাবে জানতে পেরেছিলেন। তাই পূর্ব বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও জীবন তাঁর কাব্যে শাশ্বত রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। অপরূপ মুগ্ধতায় তিনি পল্লীকে আপন সত্তার মধ্যে অনুভব করেছেন। বাংলার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি যেন ছিল তাঁর অন্তরের মধ্যে আমূল প্রোথিত। লোকজ জীবনের খাঁটি স্বাদ তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না'।[২১]

রাখালী কাব্যকে জসীম উদ্‌দীনের সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি পল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। 'প্রত্যক্ষ করেছেন সাংসারিক, সামাজিক মানুষের জীবনলীলা — স্নেহে, ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল, দুঃখ-দারিদ্রে, শোকে-ব্যাধিতে বিবর্ণ তার বিচিত্র রূপকে।'[২২]

তথ্যপঞ্জি

১. হুমায়ুন আজাদ, আধুনিক বাংলা কবিতা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৮

২. ঐ, ঐ

ঐ, পৃ. ১৫

৪. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *শিল্পীর রূপান্তর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১২৯

৫. বেগম সেলিমা খালেক, জসীম উদ্‌দীনের কবিতা : অলঙ্কার ও চিত্রকল্প, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭

৬. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীম উদ্‌দীন*, ২য় সং., ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২১

৭. তিতাশ চৌধুরী, জসীম উদ্‌দীন : কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৬

৮. জসীম উদ্‌দীন, রাখালী, ঢাকা, ২০০০, পৃ.২৯

৯. ঐ, পৃ. ৪১

১০. ঐ, পৃ. ৫৪

১১. ঐ, পৃ. ৬৬

১২. বেগম সেলিমা খালেক, পূর্বোক্ত পৃ. ১৮৪

১৩. জসীম উদ্‌দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৪ ঐ, পৃ. ৫৬

ঐ, পৃ. ৮

ঐ, পৃ. ৩৪

ঐ, পৃ. ৪২

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪

১৯ জসীম উদ্‌দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬

ঐ, পৃ. ১৯

উদ্ধৃত : আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত, ১৩৬

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭